প্রথম অধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য পরিবেশ

কবি হিসাবেই সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন বুদ্ধদেব (১৯০৮-১৯৭৪)। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই লিখেছিলেন 'মর্মবাণী' (১৯২৩-২৪) নামের কাব্যগ্রন্থ। উৎসর্গ করেছিলেন দাদামশায়কে। অবশ্য, 'মর্মবাণী' মূলতঃ রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি। তাই কাব্য হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) - তেই তিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন নিজস্ব সৃষ্টি ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবি বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে লিখেছিলেন

> কেবল কবিত্ব শক্তিমাত্র নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে,
> একদিন প্রকাশ পাবে।[১]

তিনি একথা 'মর্মবাণী' অথবা 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতা সম্পর্কে বলেন নি, বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়ে কিশোর বুদ্ধদেবের একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা হাতে পেয়ে।[২] এরপর দিলীপকুমার রায় কর্তৃক প্রেরিত বুদ্ধদেবের ছ'টি কবিতা একসঙ্গে পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হ'লো এ যেন একটি দ্বীপ।
> এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল, ফুল ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরল
> উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে একজাতীয় বেদনার উপনিবেশ।
> দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু - নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো
> প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালী - বনরাজিনীলা' তটরেখা।[৩]

কিশোর কবি বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি সত্য হয়ে উঠেছিলো। প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন একক এবং স্বতন্ত্র, পরে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব, আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা।

। ১ ।

১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। জন্মের প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি মাতৃহারা হলেন। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু পত্নীশোকে বছর খানেকের জন্য 'পরিব্রজ্যা' গ্রহণ করলেন। ফলে, বুদ্ধদেব মাতামহ মাতামহীর কাছে আশ্রয় পেলেন। মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ এফ.এ. পাশ করে প্রথমে স্কুলে ও পরে পুলিশের চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের 'প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গী।'[৪] বুদ্ধদেবকে তিনি অল্পবয়সে স্কুলে ভর্তি করেননি। নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেরকম যত্নে তিনি বুদ্ধদেবকে ইংরেজী শেখাতেন তার কোনো তুলনা হয় না। মাত্র সাত বছর বয়সের জন্মদিন থেকেই তিনি বুদ্ধদেবকে দিয়ে ইংরেজীতে রোজনামচা লেখাতে শুরু করেন।

ছয় থেকে আট বৎসরের মধ্যেই ইংরেজী কবিতার অফুরন্ত অনুরণন তাঁর কানে এসে লাগতো। একটু বড় হতে না হতেই দাদামশাই তাঁকে শার্লক হোম্‌সের কাহিনী শোনাতেন। শেকস্‌পীয়র থেকে কোনো কোনো দৃশ্য তাঁকে পড়াতেন। পোর্শিয়া শাইলক রজালিন্ড মিরান্ডার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় এই ভাবে। এই ভাবেই তাঁর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ডিকেন্স, বার্ণাডশ জন্মদিনে উপহার পেলেন তিনি। তাছাড়া 'প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা'[৫]র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাঁর চোখের সামনে পাশ্চাত্ত্য জগৎ উন্মুক্ত হ'লো। দেশ-বিদেশ থেকে প্রভু চরণ তাঁকে পাঠাতেন প্রচুর পত্র-পত্রিকা ও নানা গ্রন্থ।

> পুরো পাশ্চাত্ত্য জগৎ, ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ,
> সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-জীবনযাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল আমার
> চোখে-না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব হ'য়ে ওঠে । কত নদী
> নগর নর-নারী এই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভূচরণ, আমার
> চোদ্দ থেকে ষোলো বছরের মধ্যে, আমি যখন একটি চারা গাছের
> মতো মাটির তলা থেকে উদ্গত হচ্ছি, চাচ্ছি আমার সরু সরু
> ডালগুলোকে জগৎ জোড়া আকাশের দিকে তুলে ধরতে।[৬]

এই ভাবে তাঁর মনের মাটি পাশ্চাত্যের জীবনচিত্র রসেও ভরপুর হয়েছে। রমনার অধ্যাপক অপূর্ব কুমার চন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তিনি পড়েছেন আন্তন চেখহ্বের পত্রাবলি আর অল্ডাস হাক্‌সলির প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম-ইয়েলো'।[৭] পরবর্তীকালে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেবের জীবনে তাঁর এই পাশ্চাত্য চর্চার সুগভীর ছাপ পড়েছিলো।

দাদামশায়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষায়ও হাতেখড়ি হয় বুদ্ধদেবের। তাঁর উৎসাহেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক ও কবিতা মুখস্থ করতেন। ছেলেবেলার এই সংস্কৃত শিক্ষা ছাড়াও স্কুলে-কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিও ছিলো তাঁর আগ্রহ। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> দিদিমার পিতৃকুল সংগীতপ্রিয়, মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথ
> ভালো হার্মোনিয়ম বাজান, তাঁর পাল্লায় পড়ে আমিও দু-একটা
> গৎ বাজাতে শিখে ফেলেছি।[৮]

শৈশব থেকেই বুদ্ধবেবের ব্যক্তিস্বভাব ও অর্ন্তচেতনার মধ্যে নৈঃসঙ্গ ও একাকীত্ব বাসা বেঁধেছিল। যৌথ পরিবারে বাস করলেও তিনি কখনোই যৌথ পরিবারের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন না। দিন কাটাতেন নিরিবিলি, শব্দহীনভাবে।[৯] নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে, মাত্র নয় বছর বয়সে বুদ্ধদেব ছ-সাত স্ট্যান্‌জার একটি কবিতা লিখলেন ইংরেজীতে। জীবনের প্রথম কবিতাটি কেন তিনি ইংরেজীতে লিখলেন, তার কারণ জানাতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> আমার বয়স তখন নয় হবে বা কিছু বেশী, হেম, নবীন, মধুসূদনের সঙ্গে

চেনাশোনা হচ্ছে, আমি জানি এবং মানি এঁরা বড়ো কবি, 'মহাকবি'।
কিন্তু আসলে হয়তো অনেক বেশী ভালো লাগছে 'ওয়ান থাউজেন্ড
অ্যান্ড ওয়ান জেম্‌স অব ইংলিশ পোইট্রি' .... যার ছোটা ছোটো
অক্ষরে আমি প্রথম পড়েছিলাম ওঅর্ডস্বার্থ, কূপার, টমাস গ্রের এলিজি
এরিয়েল এর গান। আসলে আমার জীবনে তখনও রবীন্দ্রনাথের
আবির্ভাব হয়নি, শৈশবোত্তর বাংলা কবিতার অমৃতস্বাদ আমি পাইনি তখনও।[১০]

সেই প্রথম একটি ইংরেজী কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে কবিতার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ গড়ে উঠলো, তার আর বিচ্ছেদ হয়নি কখনও। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

.... আমি কবিতাকে আর ছাড়তে পারলাম না, অথবা কবিতাই আর
নিস্তার দিলো না আমাকে-কিন্তু, এরপর থেকে যা-কিছু-লিখি সবই বাংলায়।[১১]

কেন বুদ্ধদেব ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় লিখতে শুরু করলেন তার কোনো কারণ তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। মাইকেলের মতো, তাঁকে কেউ এমন পরামর্শও দেননি যে, মাতৃভাষায় লিখলে তিনি খ্যাতিলাভ করবেন। এরপর তিনি ক্রমাগত লিখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন —

আমার চলন টলোমলো, ছন্দ ভাঙা-চোরা, ... কিন্তু ক্রমশ এই
ছেলে-মানুষি চেষ্টা আমাকে সুখ দিতে লাগলো, আমার কলম হয়ে
উঠলো দ্রুত সচল, ...।[১২]

যেন মনে হয় একজন কবির হ'য়ে-ওঠার ইতিহাস আছে তাঁর ছেলেবেলার এই অংশে। ততদিনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় লেখা পাঠাতে শুরু করেছেন। অনেক লেখা ফেরৎ এসেছে। তার-ই মধ্যে একটি-দুটি ছাপাও হয়েছে।

বুদ্ধদেবের জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব এলো অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। একবার নোয়াখালির মেয়েদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব দাদামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানেই প্রথম শুনলেন রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি, দেখলেন রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়। বুদ্ধদেব লিখেছেন,

আমার মনে লেগে রইলো সেই আবৃত্তি, সেই রচনা, 'জয়সেন'
ও 'করিছেন' শব্দের অসাধারণ মিল, 'চিত্ত,' 'তীর্থ', 'নিত্য'
প্রভৃতি সমস্বর শব্দের অনুরণন-মেয়েদের বলা ছন্দ, ভাষা,
অনুপ্রাস আমার মনে এক নতুন অদ্ভুত স্বাদ ছড়িয়ে দিল, আমি
স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে,

'কৃতান্ত আমি রে তোর দুরন্ত রাবণি !
মাটি কাটি দংশে সর্পে আয়ুহীন জনে' ইত্যাদি

লাইনগুলো পড়ে শুনে বা নিজে আবৃত্তি করে ঠিক এরকম সুখ আমি
কখনো পাইনি।[১৩]

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি প্রকাশ করেছেন বয়স বেড়ে যাওয়ার অনেক পরে। 'আমার ছেলেবেলা'র রচনাকাল ১৯৭২, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭৩। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য কৈশোরের সেই টুকরো স্মৃতির অংশ, মনের গহনে উঁকি দিয়েছে কখনো কখনো। পরবর্তীকালে একজন পরিণত কবি ও কবিতার সমালোচক বুদ্ধদেবের সমালোচক সত্তার উন্মেষ পর্বের বীজ সন্ধান করা যায় এইসব টুকরো স্মৃতির খণ্ডে। রবীন্দ্র-কবিতার শব্দবন্ধ, সমস্বর শব্দের অনুরণণ এই বয়সে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যও অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে ঐ সময়েই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যতটা অভিভূত করেছিলো, তার পরিচয় আছে আরেকটি রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চয়নিকা' শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'লে, বুদ্ধদেব লিখেছেন

> সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম, নবীন,
> মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্ক-পাঠ্য বাংলা কবিতা আমি
> পড়েছিলাম তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝরে পড়ে গেলো।[১৪]

এগারো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী' তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেখানে প্রতিমাসে বেরোতো। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বই ছেলেবেলায় ঝড়ের মতো তাঁর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের গদ্য বইয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি পড়েছেন 'ছিন্নপত্র'। ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেলে যখন বুদ্ধদেব বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরছেন, তখনো তাঁরা একসঙ্গে আবৃত্তি করতেন 'ক্ষণিকা', 'অভ্র আবীর', 'বিদায় আরতি'। বুদ্ধদেবের নিজের বক্তব্য —

> পুরানা পল্টন ঃ রাতের অন্ধকারে মশারির তলায় শুয়ে আমি
> পাগলের মতো আউড়ে যাচ্ছি 'পুরবী' থেকে কবিতার
> পর কবিতা।[১৫]

এভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজগতে অবাধ বিচরণ আস্বাদন ও সম্ভোগে মগ্ন হতেন বুদ্ধদেব।

> তারপর থেকে সারাজীবন জুড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক আশ্চর্য
> সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেবের।[১৬]

এই সম্পর্কের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁদের পারস্পরিক চিঠিপত্রে, বুদ্ধদেবের নানা নিবন্ধে ও বিশেষতঃ 'সব পেয়েছির দেশে' বইটিতে।

কিশোর বয়সেই সাহিত্য বিষয়ক বিচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ণ করেছেন তিনি। তাঁর পাঠ-তালিকায় একদিকে ছিলো ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসিক, রোমান্টিক গ্রন্থাবলী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের গ্রন্থাবলী, সমকালীন মার্কিন কবিতা। অন্যদিকে ছিলো সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা, সর্বোপরি ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার।

> তাঁর অন্তর্চৈতন্যে ইতোমধ্যেই স্থায়ী ছাপ ফেলেছে ইউরোপীয়
> ভাবাদর্শ, সাহিত্যবোধ ও রোমান্টিক বোধ-ব্যাকুলতা এবং ভারত পুরান।[১৭]

জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তা এই সময় থেকেই তৈরি হচ্ছে ঃ

> সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখা। শেষের দিন পর্যন্ত
> এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অপরিবর্তিত ছিল .... ।[১৮]

আধুনিক ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা কবিতার রীতি-প্রকৃতি বিষয়েও তিনি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

> রবীন্দ্রনাথের অমোঘ প্রভাব এবং ইউরোপীয় ভাবাদর্শের
> টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তিনি নতুন কাব্যাদর্শের সন্ধানে
> ব্যাপৃত হন।[১৯]

। ২ ।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কাব্যসাধনা শুরু করলেও বুদ্ধদেব বুঝতে পেরেছিলেন 'গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।'[২০] পাঁচ বছরের ব্যবধানে লেখা তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'র (১৯৩০) কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন

> এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের
> আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।[২১]

কবি হিসেবে বুদ্ধদেব প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ প্রেমের কবি। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু করে 'নতুন পাতা' পর্যন্ত তাঁর আবেগ সংবেদনা মূলতঃ প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) থেকে 'শীতের প্রার্থনার বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায়ও প্রেম উপজীব্য। শেষ পর্যায়ে, প্রেমের কবিতা সংখ্যায় অল্প। বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন 'দেহবাদী সম্ভোগ সংরাগ'।[২২] প্রেমকে তিনি পূর্বতন রোমান্টিক কবিদের মতো অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে দেখেননি, দেখেছেন মূর্ত শরীরী রূপে। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইন্দ্রিয় ঘনতার অভাব, তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মানবিক বৃত্তির পরিবর্তে দেবসুলভ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশি। আবু-সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন -

> He was (Buddhadev Bose) amongst the first to have
> become poetically aware of the lack of sensuous element
> in the love poems of Tagore - magnificantly beautiful
> through they are, but with a beauty that is more angelic
> than human.[২৩]

বুদ্ধদেবের প্রেম-কাব্যের নায়িকা ভাবলোকবাসী মানস সুন্দরী নয়, বাসনা-মদির রক্ত মাংসের মানবী। 'প্রেমের সাধারণ মানবিক তথা ইন্দ্রিয়ঘন (Sensuous) রূপকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন'[২৪] তিনি। আর, এই জন্য ' গোল করে তোলা ঠোঁট', 'জীভের লাল আভা', 'ছোটো শাদা দাঁত', - এই অতি সাধারণ চলতি বাংলা কথাগুলির প্রয়োগে কবি এক রোমাঞ্চকর ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ রচনা করেছেন।[২৫]

তোমার গলার স্বর, ছেঁড়া ছাড়া কথার টুকরো, তোমার
চোখের আলো, গোল করে তোলা ঠোঁট দুটি, একটু জিভের
আভা, লাল আভা ! ছোটো শাদা দাঁত চকিতের বিদ্যুৎ ঝলক ![২৬]

- এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে কবিতায়।

পূর্বতন রোমান্টিক কবিরা শাশ্বত প্রেমে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব চেয়েছেন রোমান্টিকতার শোধন। তাই, নিজেকে তিনি 'দুর্মরভাবে রোমান্টিক' বললেও প্রথাগত রোমান্টিক প্রেমের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রেমকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। জীবনের এই মৌল চেতনাকে অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু এর ক্ষণিকত্ব সম্পর্কে সচেতন কবি।

আমাদের ক্ষণিক মিলন -
মিথ্যা দিয়ে, মোহ দিয়ে তাহারে করেছি চিরন্তন।
অমর করেছি তারে।[২৭]

প্রেমের এই ধারণা - অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক মহিমান্বিতও নয়। এরই সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে মানুষের মনোগত লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, হীনতা, দৈন্য ও কুশ্রীতা।

আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরন্ময় প্রেম পাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা - ।[২৮]

প্রেমের সুন্দর ও কল্যাণকর রূপের বদলে বাসনা-কামনা-লিপ্ত দেহজ প্রেমের প্রকাশ বুদ্ধদেবের প্রথম পর্যায়ের প্রেম-কবিতা গুলির বৈশিষ্ট্য। এই পর্যায়ের প্রেম-কাব্যগুলিতে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক ইন্দ্রিয়বাদী কবি। অবশ্য শুধু মাত্র দেহজ প্রেমের কামনা-বাসনা মদিরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাননি কবি। কবি-আত্মার দ্বন্দ্ব ও মুক্তি-স্পৃহা রূপায়িত হয়েছে 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাতেই।

বিধাতা জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।[২৯]

কামনা-বাসনা প্রভৃতি জৈব বৃত্তিগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও কবি অমৃতাভিলাষী। সুন্দরের জন্য তিনিও নিরন্তর উৎসুক। বেদনা ও বিক্ষোভে কবি উচ্চারণ করেছেন -

সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ভেঙ্গে দিয়ে যায়।[৩০]

সমর সেনের কবিতা-আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রেরণা আমাদের মনে
সবচেয়ে প্রবল ছিলো, আজ যদি তার কোনো নাম দিতে হয়, সেটাকে
সৌন্দর্যানুভূতি বলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে
যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, একদিকে
মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা -
এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর
অভিসম্পাত। .... আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম, তার মূলে
এই কথাটাই ছিলো।[৩১]

বিধাতার দেওয়া কামনা-বাসনা-ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যেই তিনি 'স্বপ্ন-সুধা' সঞ্চারিত করে প্রেমের মূর্তি গড়ে নিতে চান।

তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রিসম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।[৩২]

প্রেমে উত্তরণের পর্যায়টি 'প্রেম ও প্রাণ' নামক সনেটেও চমৎকার রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কামনা বাসনার মধ্যে দিয়েই প্রেমে উত্তরিত হয়ে বুদ্ধদেব বুঝে নিয়েছেন —

ওগো প্রেম মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা,
মণীষায় লভ্য জ্ঞান তুমি তার চরম সীমানা।[৩৩]

বুদ্ধদেবের প্রেম কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ভূমির পরিবর্তন ঘটেছে 'কঙ্কাবতী' কাব্যে। প্রেম কবিতার রোমান্টিক উপাদানকে চিরায়ত লোক পুরাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এখানে। দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন,

যন্ত্রযুগের চাপে শ্বাসরুদ্ধ সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনে আবেগ
সঞ্চারের জন্য কবিকে যেতে হচ্ছে পৃথিবী পরিক্রমায়।
বর্তমান থেকে সুদূর অতীত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের
কবিকর্ম থেকে তিলে তিলে সৌন্দর্য প্রেরণা আহরণ করে
গড়েতে হবে আধুনিক কাব্যের তিলোত্তমা। 'কঙ্কাবতী' হল
এই তিলোত্তমা।[৩৪]

অবশ্য এমন মনে করাও স্বাভাবিক যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের আর্থ-বাণিজ্যিক সংকটের বিরূপ অভিঘাত-স্পৃষ্ট এবং মধ্যবিত্তের হতাশা ক্লান্তি নৈরাশ্য এবং ক্রূর সময় থেকে মুক্তি-প্রত্যাশী কবি-চিত্ত রোমান্টিক বিশ্বকাব্য ঐতিহ্যে আশ্রয় নিয়েছে।[৩৫] অর্থাৎ দেহ চেতনার দ্বারা রোমান্টিক প্রেমকে ভাঙাতো গেলই না, বুদ্ধদেব যেন হয়ে পড়লেন আরো গভীরতরভাবে রোমান্টিক।

তিরিশের দশক থেকে যেসব আধুনিক কবি পৌরাণিক ভাবনাকে সফলভাবে কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অনেকেই পাশ্চাত্ত্য গ্রীক-রোমান মিথের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধদেব আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যময় পুরান প্রসঙ্গে। 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৭) 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) ইত্যাদি

ছাড়াও ১৯৪৮ সালে যখন 'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রকাশিত হ'লো তখন থেকে এই প্রবণতা দেখা দিল বিশেষভাবে। অবশ্য পাশ্চাত্য পুরাণের ঢেউও তাঁর চেতনার তটে পৌঁছে ছিল। এই সব পৌরাণিক কাহিনীর বিচিত্র উপাদান তাঁর কাব্য-চেতনা ও ব্যক্তিক অনুভূতির কাছে ভিন্ন অর্থে ধরা দিয়েছে। ভারতীয় পুরাণ কথাকে তিনি বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো সমকালীন জীবনাদর্শ ও সামাজিক মনকে বিশ্লেষণ করা। অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, উলুপী, সুভদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, চিত্রাঙ্গদা, হনুমান প্রভৃতি চরিত্রের সুপ্রাচীন ঘটনাবলী চুম্বকের মত কবিতায় এসেছে, অথচ তার মধ্যে ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যে স্পষ্ট হয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান সময় সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পৌরুষহীনতা, পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত মানসিকতা, স্মৃতিমুখরতা, কাম ও প্রেম উপভোগের পরের অতৃপ্তিবোধ।

বুদ্ধদেবের কবি-প্রতিভার আর এক দিক হল তাঁর প্রকৃতি চেতনা। ঢাকার উদার প্রকৃতি, পুরাণা-পল্টনের বিশাল প্রান্তর ও বনভূমি তাঁর কবি সত্তার উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন—

কত রাত্রে আসতে আসতে ডানদিকের সবুজ বনরেখার উপরে
লাল হয়ে চাঁদ উঠতে দেখেছি, আর আমার মন কবিতার রসে
আপ্লুত হয়ে গেছে।[৩৬]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন —

হঠাৎ এক টুকরো পাৎলা মেঘ এসে চাঁদের খানিকটা ঢেকে ফেললো
যেটুকু বেরিয়ে রইলো, রক্তিম দীপশিখার মতো জ্বলছে। চাঁদ,
আমি মনে মনে বললুম, তোমার ঐ শিখা থেকে আমি জ্বালিয়ে
নিলুম আমার মন, সে আগুন নিববে না।[৩৭]

প্রকৃতি এখানে বুদ্ধদেবের কবি-প্রতিভাকে প্রাণিত করেছে, সৃষ্টি কর্মের সহায়ক হয়ে উঠেছে। উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি কবির মনোভাবের বাহন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য, শুধুমাত্র প্রকৃতি চিত্র হিসেবে প্রকৃতির ব্যবহার তাঁর কবিতায় তেমন নেই। কখনো প্রকৃতি এসেছে দেহজ কামনার রূপক হিসেবে, কখনো বা এসেছে তাঁরই প্রেম স্বপ্নের উদ্বোধক হিসেবে -

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থ যাত্রীদলে
সহসা বন্যায়।[৩৮]

অথবা প্রকৃতি যখন প্রেম-স্বপ্নের উদ্বোধক —

তুমি এখানে কখনো যদি আসবে, মেয়ে,
শোনো, আসবে কখন ঃ
যবে আঁধার নামবে শাদা আকাশ ছেয়ে,

কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যাবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির্ নিমেষ নয়ন -
যবে জাগবে রাতের হাওয়া উতল গানে —
তুমি আসবে তখন।[৩৯]

নিসর্গ এখানে বর্ণিত হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-স্বপ্নের প্রতিবেশ রচনার জন্য। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব 'প্রকৃতি বিরোধী' কবি।

> বিশ্বজগৎ থেকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করেন কবিরা, কিন্তু
> বোদলেয়ারের ডান্ডিজমের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধদেব প্রকৃতি-বিরোধী।
> কবিকে তিনি মনে করেন প্রকৃতির প্রতিপক্ষ।[৪০]

এমনও মনে করা যায় যে, বোদলেয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হবার পরই বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতি বিরোধী হয়ে পড়েন। কেননা, বোদলেয়ার উনিশ শতকী রোমান্টিকতার যেমন বিরোধী তেমনি প্রকৃতিরও বিরোধী। তাঁর সাধনা —

> প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার।[৪১]

বুদ্ধদেবের নিজেরও বক্তব্য —

> ... মানুষ প্রকৃতিচ্যুত, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিদ্রাময় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন,
> তার চৈতন্যের প্রভাবে সে যা কিছু হতে চায়, হতে পারে, এবং
> কখনো কখনো হয়েও থাকে, তার সমস্তটাই প্রকৃতির বিরোধী।
> উনিশ শতকী কবিদের মধ্যে এই কথাটি সবচেয়ে তীব্রভাবে উপলব্ধি
> ও উচ্চারণ করেন বোদলেয়ার।[৪২]

তাঁর আরেকটি বক্তব্য —

> যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি তার মধ্যে উনিশ শতকের অবদান
> প্রচুর - তার একটি মূল সূত্র হ'লো, ... প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা।[৪৩]

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে তীক্ষ্ণ চৈতন্যে শান দিয়েছেন তিনি। এ পর্যায়ে ফুল-পাখি-অরণ্য-পর্বত প্রভৃতি নিসর্গ দৃশ্যও তাঁর কবিতায় অস্বীকৃত। প্রকৃতি তাঁকে কিছুই দিতে পারে না -

> প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে।
> ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায় - ঘাস, মাটি, পুকুর আকাশ,
> ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
> ডুবে যা নিরভিমান, একতাল বিশ্বস্ত নির্বেদে।[৪৪]

এই সময় থেকে তাঁর ধারণা, কবিতা হল প্রখর চৈতন্যের ফসল। যে কাব্যভুবন তিনি নির্মাণ করেন সেখানে প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' - এও বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে যে, - যাকে সুন্দর বলা যায় তাও নেই প্রকৃতিতে, সৌন্দর্য কবিরই সৃষ্টি, কবিই তা প্রকৃতিতে আরোপ করেন। মোহিনী প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কবি স্বয়ং রচনা করেন - সৌন্দর্য ও প্রেমের কাব্য ভুবন।

.... আকাঙ্ক্ষার পশ্চাদ্ধাবনে
মত্ত হয়ে ভোলা যায় লোলজিহ্ব হন্তা প্রকৃতির
প্রতারণা - মোহিনী ও মনোহীনা যিনি, প্রেরণায়
আদিম, অপরাজেয়। কিন্তু আমি তাঁকেও ছাড়িয়ে
সৃষ্টি করি সৌন্দর্য এবং প্রেম, অহংসর্বস্ব
এক অন্য বিশ্ব গড়ে তুলি, বায়বীয় ধারণার
উপাদানে।[৪৫]

অবশ্য কখনো কখনো ভাবনা দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়েছেন কবি।

কখনো ভেবেছি শিল্পী প্রকৃতির প্রতিযোগী, তার সব অভাব মেটান,
কিন্তু যদি প্রতিভাও প্রাণের প্রকাশমাত্র, আর প্রাণ শরীর নির্ভর,
তাহ'লে কবিতা, ছবি, কিছু নেই প্রকৃতির অধীন যা নয়।[৪৬]

তাহলেও সেই ভাবনা দ্বন্দ্বে স্থিত হন নি কবি। আসলে, প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধদেব প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রথাগত রোমান্টিক ভাবের কবি। পরে তিনিই প্রকৃতি বিরোধী, মানব চৈতন্যের মহিমায় আস্থাশীল।

আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হ'ল বিচ্ছিন্নতা বা Alienation। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা, নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব , হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ রূপায়িত হয়েছে আধুনিক কবিতায়। এই চেতনা বুদ্ধদেবের কবি-মানসিকতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট সম্পর্কে সচেতন তিনি। সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বের যন্ত্রণা রূপ লাভ করেছে তাঁর রচনায়। সমাজ-সংঘ-বিচ্ছিন্ন এই মনোভঙ্গি আধুনিক সাহিত্যেরই লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় সমাজ ও সমষ্টি বিচ্ছিন্ন একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। জীবনানন্দ দাশ প্রথম দিকে নিঃসঙ্গ বোধের ফলে নিমজ্জিত হয়েছেন অতীত ইতিহাস ও ধূসর ঐতিহ্যলোকে।[৪৭] বিষ্ণু দে সমষ্টি চেতনায় বিশ্বাসী। তবু তাঁর কবিতায়ও বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু আকৈশোর নিঃসঙ্গ। কবি জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সমাজ, রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কবি জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বছর বাংলা তথা ভারতবর্ষের পটভূমিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুহুর্মুহু কম্পিত হয়েছে। তবুও কবি রাজনীতি প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন। এজন্য, তাঁকে কেউ কেউ 'এস্কেপিস্ট বা জীবন পলাতক অপবাদ দিয়েছিলেন।'[৪৮] আত্মপক্ষ সমর্থন করে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন—

আমি যদি কবি হই, তাহলে কবি হিসেবে আমার কর্ত্তব্য
ভালো কবিতা লেখা তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে

সেই আমার যোগসূত্র। আমি যদি বাণিজ্য কি রাজনীতি সম্বন্ধে
মূঢ় হই, ... তাহলে ক্ষতি কি ? আমি বরং বলবো, ভালো
কবিতা লেখবার জন্য যে রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে
সবচেয়ে অনুকূল বলে জানি, আমি চাইবো আমার জীবনকে
সে-ভাবেই গড়তে, সেটা এস্কেপিজম নয়, সেটা শুভবুদ্ধি।[৪৯]

বুদ্ধদেবের সমগ্র সাহিত্য জীবনে এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া 'দময়ন্তী'র উৎসর্গ' পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব তাঁর নিজের মানস প্রকৃতি বিধৃত করেছেন 'সমর সেন স্মরণীয়েষু' কবিতায় —

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলক ধাঁধায়,

. . .

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,
সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।[৫০]

- 'সংঘহীন সংজ্ঞাতীত' এই একক নিঃসঙ্গ জীবনে বুদ্ধদেব অবিরত সৃষ্টিশীল কবি। আমেরিকার পিটাসবার্গে অবস্থান কালে শীতরাত্রির নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'। এই কবিতাটির রচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

আর, এমনি একটি রাত্রে আমার নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ ও
নির্যাতনকারী শীতের মধ্য থেকে, অতর্কিতে একটি 'শীতরাত্রির
প্রার্থনা' বেরিয়ে এসেছিলো।[৫১]

'যে আঁধার আলোর অধিক'- এও কবি বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং একক -

শুধু স্বপ্ন শুনে শুনে একতাল ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর -
নিঃসঙ্গতা ! জেনেছি তোমারই নাম শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বৎসর।[৫২]

'মরচে-পড়া পেরেকের গান' এর নাম কবিতাটিতেও 'মিথকল্পের পৌরাণিক প্রচ্ছদে'[৫৩] বুদ্ধদেব রূপায়িত করেছেন আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা। বিরূপ বিশ্বে জড়বাদী সভ্যতায় একজন অনুভূতিশীল চৈতণ্যবান কবি-শিল্পীর স্থান কোথায় এই সমস্যা বুদ্ধদেবকে একজন বোদলেয়ার, একজন ইয়েটস্ বা একজন এলিয়টের মতোই কাতর করেছে।[৫৪] 'অন্যপ্রভু' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

আমি কবি ! শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত .... নির্বাসিত
... অন্ন শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে ?[৫৫]

যুদ্ধোত্তর কালের অনেক কবি শিল্পীর মতোই বুদ্ধদেবের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাবোধ।[৫৬]

মৃত্যু বিষয়ে সংবেদনাও বুদ্ধদেবের কবি-মানসিকতার অন্তর্গত। তাঁর প্রিয় প্রতীচ্য কবি বোদলেয়ার, রিলকে এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে গভীর চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

> বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে কোনো গাঢ় চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তাঁর রচনায় ধীরে ধীরে মৃত্যু ভাবনা দানা বেঁধে উঠেছে। .... শেষ পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসু চেষ্টা করেছেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার, পুনর্বার ফিরে এসেছেন জন্মান্তর ধারণায়। জন্মান্তর ধারণাকে সামনে রেখেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন মৃত্যুকে।[৫৭]

জন্মান্তর ধারণায় বিশ্বাসী কবি লিখেছেন —

> এক জন্ম শেষ করে আরেক জন্মের আগে -
> আর কিছু নয় - শুধু চিন্তারে বিছাই
> দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে।[৫৮]

অথবা 'স্বাগত-বিদায়ে'র 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর সেতুবন্ধন রচিত হল —

> .... আমারই মধ্যে এই এক মুহূর্তে ও প্রতি মুহূর্তেই
> এক শিশু এখনো জীবন লিপ্সু, এক যুবা এখনো ধরায় চুল্লি হৃদপিণ্ডে,
> এক বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে চলে অন্তিম শয্যার দিকে।
> যেন প্রতি মুহূর্তেই জন্ম আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন,
> ঊনষাট বৎসর ধরে সেই এক মুহূর্তে পুনরাবৃত্ত -
> এক মৃত্যু, যুগপৎ নতুন জীবন।[৫৯]

বুদ্ধদেবের কবিতা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত।

> অন্তর্চৈতন্যে উপলব্ধ স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা, যন্ত্রণা ও ক্ষত, বেদনা ও অচরিতার্থতা, এবং অস্তিত্ববোধ ও অস্তিত্বসংকট তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছে।[৬০]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতকেও জীবনের প্রধান সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই আধুনিক মনোভাবের সচেতন ও নির্ভীক প্রকাশ প্রথম রূপ নিয়েছিল 'বন্দীর বন্দনায়।'[৬১] সেখানে তিনি জানিয়েছেন —

> অলস আবেশে মোরা জীবনেরে দেখিনি মধুর,

ললাটে ঝরিছে স্বেদ-তারই স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ-তারই জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।[৬২]

এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হয়েছেন আধুনিকরা। বুদ্ধদেব স্পষ্ট উচ্চারণে তা ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রভাব-জগতের সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনা আর নয়, কবির রক্তব্য —

সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গন।[৬৩]

রোমান্টিক কবিরা ব্যক্তিক অনুভূতির প্রাধান্য দিলেও কবির 'সত্য-শিব-সুন্দর' সন্ধানী এক সত্তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যকে তাঁরা বৃহৎ অর্থে সমাজের মঙ্গল সাধনের সঙ্গে একীকৃত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিকেরা ব্যক্তিত্ত্বের আরো গভীরে অবতরণ করলেন, সেখানে সমাজ, সত্য, মঙ্গল প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে জেগে রইল শুধু এক আত্মা।[৬৪] বুদ্ধদেবের অন্তর্চৈতন্য -

বহির্বাস্তব বিশ্ব ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সূত্রে
আবদ্ধ নয়। .... সামাজিক রাজনৈতিক কল্যাণ চিন্তায় পরিকীর্ণ নয়
তাঁর কবিতা।[৬৫]

তাঁর কবিতায় এসেছে ইন্দ্রিয় চেতনা, প্রকৃতি-বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা (Alienation), কবির নিজস্ব চৈতন্য-মেধা-মনন-অনুভূতি ও আবেগ-সংবেদনার মাধ্যমে কবির আত্ম-আবিষ্কার।

..... তবু জেনো তুমি যাকে বলো -
সুন্দর, তা নেই ব্যাপ্ত বহুরূপী পঞ্চভূতে, নেই
চিত্রল উদ্ভিদে, কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণ সমারোহে
আছে শুধু আমারই অহমিকায়।[৬৬]

-অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির বক্তব্য —

.... আমি হীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিতঃ
প্রকৃতি ও কাল শুধু নটনটী, আমি নাট্যকার,
এবং দ্রষ্টাও আমি - যতক্ষণ শেষে বজ্রপাতে
বিলুপ্ত নাহয় সত্তা, মহাবিশ্ব, আর ভগবান।[৬৭]

আধুনিক কবির এই 'আত্ম'ই আধুনিক শিল্পসার ঃ শুদ্ধ সৌন্দর্যরূপে উপস্থিত কবির ব্যক্তিত্ব যা তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।[৬৮]

। ৩ ।

চিরাগত রোমান্টিক কাব্যের ধারণায় একটা বিপ্লব অবশ্য ইতোপূর্বেই দেখা দিয়েছিলো। জীবনের অখণ্ডতা ও স্থিতিবোধ প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতেই খণ্ডিত হয়েছে। কালপ্রভাবে পূর্বতন ধারণার জগতেও

31 DEC 2003

পরিবর্তন এসেছে। বিচলিত হয়েছে পূর্বতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। কবির মনোভূমিতেও দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। এরই মধ্যে অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১) প্রমুখ কবি চিরাগত 'সৌন্দর্যচেতনা ও নিসর্গের নিষ্কুণ্ঠ রূপায়ণে, অতি তরল রোমান্টিক চেতনায় এবং অবয়ব-বিমুখ ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম চেতনার সঙ্গে একাত্ম'[৬৯] হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা মূলতঃ রাবীন্দ্রিক কাব্য-কৌশল ও কাব্যিক প্রাসাধনেরই অনুবর্তন করেছেন। সেই সময় রবীন্দ্র বলয় থেকে বাইরে বেরিয়ে কাব্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তিন কবি - মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রোত্তর কবিতার এই ধারাই বাংলা কবিতার আধুনিক ধারা। পরবর্তী দশকে আধুনিক কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবই অগ্রগণ্য। তিনিই সর্ব প্রথম সচেতনভাবে সুদৃঢ় ভঙ্গিতে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরোধিতা করে কবিতার বাক্‌মূর্ত্তি ও ভাবমূর্ত্তি আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। আধুনিক বাংলা কবিতার এই প্রবর্তনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নিঃসঙ্গ ছিলেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত - এঁরাও সহযোগী ছিলেন। এক হিসেবে, আধুনিক বাংলা কবিতার একটি যুগকে লালন করেছেন এই কবি চতুষ্টয়। এরপর, আধুনিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয়ের আর অবকাশ থাকলো না। এই দশকের আধুনিকদের মধ্যে জীবনানন্দ প্রথম রবীন্দ্র প্রভাব ব্যতিরেকে কবিতা লিখেছিলেন অন্যমনে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতায় প্রথম স্রষ্টা তিনি। কিন্তু কবিতা জগতে নতুন কোনো আন্দোলন কিংবা আধুনিক কবিতার প্রতিষ্ঠা প্রচার - এসব তাঁর চিন্তার অন্তর্গত হয়নি কখনো। অথবা চিন্তার অন্তর্গত হয়েছে গভীরভাবে, কাজের দৃষ্টান্তের নীরবতার মধ্য দিয়ে। 'নির্জনতার কবি' নীরবে নিভৃতে কাব্যচর্চা করেছেন গণ সংযোগ পর্যন্ত যেন সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?[৭০]

- এই উচ্চারণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। কিন্তু আধুনিক কবিতার যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ঐ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যবর্তী সময় (১৯৩৫ খ্রীঃ নাগাদ), যা একটি স্থায়ী চেহারা লাভ করেছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রায় একক ভাবে বুদ্ধদেব বসু। 'প্রগতি'র (জৈষ্ঠ, ১৩৩৫) 'মাসিকী'তে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব
movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি,
এবং সেই নবরসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে
গ্রহণ করাবার ভার 'প্রগতি' নিয়েছে।[৭১]

'প্রগতি' সম্পাদনা কালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন -

বিশ্বের শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে বাংলার চিত্তের যোগস্থাপন
করতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবন যে কোনো
মতেই ফুলে ফুলবন্ত হয়ে উঠতে পারবে না।[৭২]

আর 'কবিতা' (১৯৩৫) প্রকাশিত হ'লে সমকালীন সাহিত্য পরিবেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে প্রায় সংগ্রাম করতে হ'লো। এই সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া যায় কবিতা পত্রিকার পাতায় পাতায়। একে 'সংগ্রাম' নামেই চিহ্নিত করা যায় এই কারণে যে, 'কবিতা'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলো, 'শনিবারের চিঠি'র লেখক গোষ্ঠী। মূলতঃ আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে বুদ্ধদেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিপরীত মেরুতে ছিলেন সজনীকান্ত এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দ। 'শনিবারের চিঠি'র সার্থক ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে — রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরা নতুন সুরের স্রষ্টা, তাঁদের অধিকাংশ এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আক্রমনের লক্ষ্য হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর আধুনিক সাহিত্যে অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিলো ভাঙন, অনিশ্চিতি, নেতিবাচকতা। 'কল্লোল' (১৯২৩) - 'কালিকলম' (১৯২৬) - 'প্রগতি'র (১৯২৭) পথ ধরে এই নেতিবোধের কবিতাই যখন অস্তিত্বের শিকড় সন্ধানে দিশেহারা, আধুনিক বাংলা কবিতার সেই অনিকেত দিনগুলিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা অনেকটা প্রতিপক্ষীয় শরাঘাতকারী যোদ্ধার মতো। আধুনিক লেখকদের সরাসরি আক্রমন করা হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে। সজনীকান্ত নিজেও "তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ"[৭৩] করবার কথা বলেছেন। তবে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগ ছিল

অশ্লীলতা, দুর্নীতি, যৌনতা, ব্যভিচার, মূল্যবোধ, বিদেশী অনুকরণ,
অক্ষমতা, রবীন্দ্র বিরুদ্ধতা, যুগসৃষ্টির দম্ভ অক্ষমতা ভাষাদৃষ্টি, বাংলা
ভাষা ব্যবহার, আত্মপ্রচার, দুর্বোধ্যতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রভৃতি।[৭৪]

মূলতঃ আধুনিকদের বিরুদ্ধেই সজনীকান্তের অভিযোগ ছিল অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, আত্মপ্রচার, যৌনতা, বিকৃত মানসিকতা প্রভৃতির। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক মনোভাবাপন্ন লেখক সম্প্রদায়ের হয়ে অবিরত মসীযুদ্ধ চালিয়েছেন বুদ্ধদেব। 'প্রগতি'র সময় থেকেই তিনি এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর 'কবিতা' প্রকাশিত হলে, এর প্রত্যেক সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যে, বিভিন্ন সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি একহাতে 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, অন্যদিকে এইসব কবিদের নবনির্মিত কবিতার ভিত্তি ভূমিটি প্রস্তুত করেছেন। 'কবিতা' সম্পাদনা কালে তিনি যেন সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

। ৪ ।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বুদ্ধদেব নিষ্ঠাবান কর্মী, সংগঠক, সম্পাদক ও সমালোচক। ছেলেবেলায় রাশি রাশি কবিতা লিখে 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামের হাতে লেখা মাসিক পত্রের সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার হয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবের নিজস্ব একটি হাতে

লেখা কাগজ ছিল, তার নাম ছিল 'ক্ষণিকা'।[৭৫] এছাড়া, ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'তোষিণী'তে কলকাতার 'অর্চনা'য় লেখা ছাপা হয়েছে তাঁর। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (বাংলা ১৩৩৪, আষাঢ়) বুদ্ধদেব ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে হাতে লেখা 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব আই. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাওয়ায় পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশনার সুবিধা হ'ল। যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি তখন উনিশ বছরের যুবক। 'প্রগতি'র প্রথম বর্ষের বারো মাসের মধ্যে এগারো মাসের পত্রিকাতে 'মাসিকী' শীর্ষক একটি সমালোচনা অংশ থাকতো। এই সমালোচনায় 'প্রগতি'র নিজস্ব বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য ব্যতীতও প্রায় প্রত্যেকটিতেই সমকালীন সাহিত্য সমালোচনা থাকত। এই সমালোচনা গুলির শেষে লেখকের সম্পূর্ণ নাম না থাকলেও সাধারণতঃ নামের আদ্যাক্ষর থাকতো।'[৭৬] এই 'মাসিকী' সমালোচনা লিখতেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রভু গুহঠাকুরতা প্রমুখ। কিন্তু এর অধিকাংশই লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু নিজে।[৭৭] 'প্রগতি' পত্রিকার চার বছরেরও বেশি পূর্বে (বৈশাখ, ১৩৩০) 'কল্লোল' নামের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'প্রগতি' প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব একে 'কল্লোলে'রই একটি টুকরো'[৭৮] বলেছেন। অবশ্য 'প্রগতি'র তুলনায় কল্লোলের বিশেষত্ব ছিল।

> প্রগতি'র প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ - 'কল্লোলে' যে জিনিশটি কখনো স্থান পায়নি বা উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থান পায়নি।[৭৯]

'প্রগতি'র এই বিভাগের জন্য লেখাও পাওয়া যেতো না খুব বেশী। এ অংশও বুদ্ধদেব নিজেই লিখতেন। তাঁর মনে হয়েছে -

> সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিল বিশেষভাবে তর্কমুখর।[৮০]

তর্কের প্রত্যুত্তর দিতেন বুদ্ধদেবই। শুধু প্রত্যুত্তর দেবার জন্য নয়, 'নিজের কিছু বক্তব্য আছে বলেও'[৮১] তিনি সোচ্চার হয়েছেন এই সময়। অবশ্য তাঁর নিজেরই কথা —

> আমার সে সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিল, গদ্য ছিলো ইংরেজি বকুনি মেশানো, নড়বড়ে, ... ।[৮২]

তখন থেকেই নিজের প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় তিনি অকুণ্ঠচিত্ত। 'প্রগতি' পত্রিকাতেই প্রথম সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিলো জীবনানন্দকে। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> সেই দূর সময়ে যখন 'গণ্ডার কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির অন্য কোথাও সমর্থন সূচক প্রয়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্দ্ধিত হল জীবনানন্দ ....

এবং এটাও উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি
অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা করেছিলাম।[৮৩]

বোঝাপড়া মানে —

এমন কোনো ব্যবস্থা কিংবা বলা যাক, আমাদের দিক থেকে
প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না
থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে
তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ ...।[৮৪]

বুদ্ধদেব নিজে তাঁদের প্রচেষ্টাকে 'রবীন্দ্র বিদ্রোহ' বলতে চাননি। তাছাড়া 'রবীন্দ্র বিদ্রোহ'ই এক মাত্র উদ্দেশ্য হ'লে এই সাহিত্যিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় হয়ে ওঠে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সাহিত্যের পক্ষেএর আবেদনও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু, রবীন্দ্র বলয়ে আবদ্ধ না থাকার যে সাহিত্যিক প্রস্তুতি-তা অবশ্যই সাহিত্যের এক নতুন অভিযাত্রা। তিনি আরেকটি জায়গায়ও উল্লেখ করেছেন —

রবীন্দ্রনাথের জাল থেকে বেরোবার চেষ্টায় আমরা কোনো বিকল্প
খুঁজছি তখন মাতৃভাষায় এমন কোনো কাব্যাদর্শ, যাতে নতুনের
ইঙ্গিত আছে।[৮৫]

নতুনের ইঙ্গিত খুঁজে খুঁজেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অনেক কবিকে। তাঁর মনে হয়েছে —

প্রতি যুগের এক-একটি কথা বলবার থাকে। ... বিভিন্ন যুগের
বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে তাকেও নব নব রূপ
নিয়ে গড়ে উঠতে হয়ে।[৮৬]

রবীন্দ্রোত্তর এই আধুনিক যুগটির কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

যুগ প্রবর্তক কে জানি নে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি
সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে বাংলা সাহিত্য জগতে এসে গিয়েছে, এ
বিষয়ে আর সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে না। ... এঁদের রচনার
বিষয়বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা ও বেদনা পূর্বতন সাহিত্যিকদের
চাইতে একেবারে আলাদা ...।[৮৭]

অবশ্য বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে —

আধুনিকরা কেবল নূতন একটা কিছু করবেন ব'লেই এই সমস্ত
জিনিসের অবতারনা করেন নি। মর্ম্মে
মর্ম্মে জীবনের প্রতি পলে তাঁরা যা অনুভব করেছেন, তাদের
সাহিত্যেও তা-ই প্রকাশ পেয়েছে।[৮৮]

এ বিষয়ে 'প্রগতি'র 'মাসিকী'তে তিনি প্রচুর লিখেছেন। এই লেখাগুলি থেকেও তরুণ বুদ্ধদেবের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিশেষতঃ চিরাগত সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিক সাহিত্যে'র

বক্তব্যগত ও রূপগত পরিবর্তন[৮৯] যে সাধিত হয়েছে, তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে 'প্রগতি'তে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বক্তব্য নিম্নরূপ —

(ক) আতি আধুনিক সাহিত্যকে Post-war সাহিত্য বললে ভুল হয়না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই Post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। .... আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করেছেন বঙ্কিম বাবুর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় তাঁর চিহ্নমাত্র ছিল না। ... সেই সুখে শান্তিতে, আনন্দে কল্যানে, হাসিতে স্বচ্ছলতায় পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন গৃহ বাংলায় কি আর আছে ? দারিদ্র্য যে কত অমঙ্গলের জন্ম দেয় তার আর ইয়ত্তা নেই ....।[৯০]

(খ) আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি, খামকা একটা জিনিস খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলতে আর প্রস্তুত নই। .... একথা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়ে যাবে যে, ভগবান, ভুত ও ভালোবাসা এ তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।[৯১]

(গ) আধুনিকদের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের যে মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার জন্য বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। এ হচ্ছে Time spirit বা যুগধর্ম্মের ফল।[৯২]

শুধু আধুনিক সাহিত্য বিষয়েই নয়, আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও 'প্রগতি'র সময় থেকেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি মনে করেন,

> প্রত্রিকার সম্পাদনার কাজ যাঁরা গ্রহন করেন, তাঁদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্যের ভার থাকে - সে হচ্ছে অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য সমাজে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[৯৩]

'প্রগতি'র সম্পাদক হিসেবে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন আনন্দের সঙ্গে। 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা', 'প্রগতি'র পাতা ভরাবার জন্য 'কপি' তৈরী করা, আরো নানা রকম লেখায়[৯৪] তিনি মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতেন না। মাত্র তিন বছর (১৯২৭-৩০) প্রকাশিত হয়েছিলো 'প্রগতি'। এরই মধ্যে বুদ্ধদেবের মনে হ'তো —

> .... দিন গুলি যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি, একটু বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। ... সাহিত্যের উৎসাহ, নতুন সব জিনিস লেখা, কল্পনার প্রসার, ... বছর

দুই সময়ের মধ্যে আমার মন সৌন্দর্যে সাহসে দুরাশায়
আত্ম-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো।[৯৫]

'প্রগতি'র সময় থেকেই একদিকে সমসাময়িক সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব, অন্য দিকে সমকালীন লেখক গোষ্ঠীর হ'য়ে আধুনিকতার সপক্ষে অবিরত চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি।

১৯৩১ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হ'লো 'পরিচয়' পত্রিকা। প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় 'পরিচয়ে'র গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিলো। বুদ্ধদেব অবশ্য 'পরিচয়'এর সাহিত্যের মজলিশে 'মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য'[৯৬] পেতেন না। তাঁর মনে হয়েছে, 'পরিচয়'-এর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর

'সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ক, তত্ত্বালোচনায় এঁদের
যতটা দক্ষতা সাহিত্যরচনায় ততটা নয় ....।'[৯৭]

এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখক দুজনমাত্র ঃ সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে।[৯৮] ১৯৩৫ সালে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। এই বছরের অক্টোবরে, শুধুমাত্র কবিতার জন্য প্রকাশিত হ'লো 'কবিতা' নামের একটি পত্রিকা। সম্পাদন করলেন যৌথভাবে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সহকারী সমর সেন। ইতিমধ্যে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বুদ্ধদেব। ৪৭ নং পুরানা পল্টন, রম্না, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি'ও বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের উৎস ও প্রকৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

'কবিতা' বের করার সময় বা পরবর্তীকালে, আমাদের সামনে
কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, একথা বললে অতিরঞ্জন হবে।
যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, ... কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন
আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমপ্রকাশ
উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে না হয়
রঙ-বেরঙের মধ্যে, অনেক বেশী গলার জোর-ওলা-অন্যান্য
বিষয়ের মধ্যে-যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় স্বধর্মীর সঙ্গে
সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্প সংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের
কাছে ....।[৯৯]

কবিতা সম্পাদনার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

তিরিশের বছর গুলিতে যেসব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে
এসেছিলেন, যাদের ক্রিয়ার কালাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের
পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদেরই বাহন ও প্রচারক
রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ।[১০০]

তাছাড়া, আরো বেশি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরচনায় উন্মুখ নবীনদের উৎসাহিত করতেও তিনি চেয়েছেন।[১০১] 'কবিতা'য় যাঁর রচনা প্রথম বেরিয়েছে, দু-এক বছরের মধ্যেই তাঁরা কোনো না কোনো ভাবে খ্যাতি অর্জনও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, 'কবিতা'য় রচনা প্রথম প্রকাশিত হলে পাঠকের কাছে খ্যাত হয়েছেন, এমন কবির সংখ্যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগণ্য। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরাই কবিতা লিখেছেন প্রায় সকলের কবিতা 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত জানিয়ে বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন —

> এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য বারোয়ারির
> দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের
> সঙ্গে এঁরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে ....।[১০২]

আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন —

> তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে মাশুল
> আছে, তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।[১০৩]

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করে বুদ্ধদেব একাজ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নিজে একজন সৃজনশীল লেখক হয়ে অন্য লেখকদের প্রতিষ্ঠার জন্য, রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার আদর্শ রূপায়নের জন্য নিয়মিত ভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। সহকর্মীরা একে একে উৎসাহহীন হয়েছেন। প্রথমে ও দ্বিতীয় বছরে সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম আছে, সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তারপর থেকে সম্পাদক শুধুই বুদ্ধদেব বসু।[১০৪] একক ভাবেও তিনি আরো প্রায় কুড়ি বছর 'কবিতা' সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর-ই মধ্যে সমকালীন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ লেখকদের তিনি জায়গা করে দিয়েছেন 'কবিতা'য়, নিজে তাঁদের কবিতার সমালোচনা লিখে পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ স্থাপন করেছেন, কনিষ্ঠ কবিরাও সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছেন 'কবিতা'য়। রবীন্দ্রোত্তর এই কবিদের কাব্যাদর্শ প্রচারের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আধুনিক কবিতার পাঠককে শিক্ষিত করবার জন্যও তাঁর চেষ্টা ছিল সীমাহীন। রবীন্দ্র জগৎ থেকে বাইরে বেরিয়ে কবিতায় নতুন সুরের সাধনা করলেও মোহিতলাল, নজরুল বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রোত্তর কোনো কাব্যদর্শ প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ কবি। সমালোচনা বা কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁরা অনুল্লেখ্য। মোহিতলাল কবি, সমালোচক ও সাহিত্য তাত্ত্বিক। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা বা কাব্যাদর্শের কথা বিশেষ ভাবে ভাবেন নি। ভেবেছেন ব্যাক্ত ভাবে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যাদর্শের জন্য। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব কিরকম হওয়া উচিত, ব্যাখ্যা করেছেন, খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন, সাহিত্যের ধর্ম ও সাহিত্যের সত্যকে শিক্ষিত বাঙালির মনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

> কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কোনো কাব্যাদর্শের কথা তিনি বলেন না,
> বরং ফিরিয়ে আনতে চান মধুসূদন বঙ্কিম লালিত আদর্শই।[১০৫]

এদিক থেকে বুদ্ধদেব ব্যতিক্রম। তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী নতুন কবিতার স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব ও আদর্শ

প্রতিষ্ঠা জন্য নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে যাতে সাহায্য হয়, এজন্য তিনি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করেছেন। আধুনিক কবিতা কী, আধুনিক কবিরা কী করেছেন - এই সব মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই খুঁজে নিয়েছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন -

> এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে
> নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর।[১০৬]

যেসব কবিরা রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর এনেছেন কাব্যে, তাঁদের কাব্যাদর্শের স্বরূপ সন্ধান করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে কাব্যাদর্শে ভিন্ন এইসব কবি অনেক শক্তিমান কবি, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকে নিজেরা নিজের ধরনে নবীনতর ধারণার স্রষ্টা, এলিয়টের ভাষায় 'Creator of ideas.'[১০৭]

বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ বেশির ভাগ সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে। তবে, বিস্তার বেশি আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ক রচনার। রবীন্দ্র সমালোচনার সংখ্যাও কম নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রসঙ্গ তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায়। 'কবিতা'র প্রথম বছরের (১৯৩৫-১৯৩৬) চারটি সংখ্যায়, চারটি অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় গদ্যে, বুদ্ধদেব কবিতা বিষয়ক অনেক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। প্রবন্ধগুলি হলো - 'কবিতার দুর্বোধ্যতা', 'আধুনিকতার মোহ', 'গদ্য ছন্দ' ও 'কবিতার পাঠক'। এই পর্বে বুদ্ধদেব একদিকে নিজে সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তরুণ লেখকদের নতুন সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতেও চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে লেখকদের মনন-মানসিকতার মধ্যেও যখন ঘটে গেছে পরিবর্তন, কবিতার সেই কালান্তর, সেই রূপান্তরও যে বাংলা সাহিত্যে জায়গা পেতে পারে, তা যে আকাশ-কুসুম নয়, এদের-ই মনন-চৈতন্য ও জীবনবোধের ফসল, তা বুঝিয়ে দেবার গুরুদায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কবিতাকে নতুন ভাবে পাদ-প্রদীপের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। এজন্য শুরু হ'লো রীতিমতো একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন মুখপাত্র রূপে চিহ্নিত হ'লো 'কবিতা' পত্রিকা। অবশ্য, কবিতা বিষয়ে আদৌ কোনো আন্দোলন সম্ভব কি-না, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় - যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার - তোলপাড়ই সাধারণতঃ আন্দোলনের পর্যায়ে পড়ে। এদিক থেকে বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকা আধুনিক কাব্য আন্দোলনের একটি স্থায়ী রূপ। এই কাব্য আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব-ই। এরপর, কবিতা বিষয়ে ধারণাই বদ্‌লে গেলো। জীবনের খণ্ডতা অবক্ষয়-ভাঙচুর ক্লেদ-পঙ্কিলতা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রেম-কাম-যৌনতা - এসব নিয়ে যেমন সমগ্র মানব সভ্যতা, কবিতাও এর বাইরে নয়, এই প্রগাঢ় আলো-অন্ধকারের বৃত্তেই কবিতার নিজস্ব জগৎ। এই আলো-আঁধারের মধ্যেই কবির অমৃত-সন্ধান। সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণায় বিশ্বাসী প্রথানুগ কবি, সমালোচক এতে বিস্মিত হলেন। বিশেষতঃ রক্ষণশীল লেখকগোষ্ঠী একে ব্যাভিচার নামেই চিহ্নিত করতে চাইলেন। বাংলা সাহিত্যের এরকম একটি ক্রান্তি পর্বে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হলেন। মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে জন্মগ্রহন করে যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের পুরোধা হয়ে উঠলেন তিনি। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের এই 'মোড়ফেরা'ই আধুনিকতা। আধুনিক কবিতার সূত্রপাত হ'লো এখান থেকে। এদিক থেকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি যুগ সৃষ্টি করলেন তিনি।

নির্দেশিকা

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নবীন কবি', বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলকাতা, বর্নালী, ১৯৭৮, পৃঃ ১

২. তাদেব, পৃঃ ১

৩. তদেব, পৃঃ ২

৪. বসু, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৩, পৃঃ১২

৫. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ৩

৬. বসু, বুদ্ধদেব, রচনাসংগ্রহ, ৩-য় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৪২

৭. বসু, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৩, পৃঃ১০২

৮. তদেব, পৃঃ ৭২

৯. তদেব, পৃঃ ১৬

১০. তদেব, পৃঃ ৩৪

১১. তদেব, পৃঃ ৩৫

১২. তদেব, পৃঃ ৩৫

১৩. তদেব, পৃঃ ৫১

১৪. তদেব, পৃঃ ৫০

১৫. তদেব, পৃঃ ৯৬

১৬. ঘোষ, সুদক্ষিণা, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, ২০শে মে ১৯৯৭ পৃঃ৩১

১৭. সাদিক, মাহবুব, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১,পৃঃ৯

১৮. সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৮'পৃঃ২৯

১৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ ৯

২০. বসু, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা, দে'জ, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১, পৃ ঃ ১১৮

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নবীন কবি, 'কলকাতা, সপ্তম-অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ - জানুয়ারী ১৯৬৯, পৃ ঃ ৫৬

২২. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৩

২৩. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, Tendencies in Modern Bengali poetry, পথের শেষ কোথায়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭, পৃঃ ২৩১

২৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃঃ ৮৫

২৫. তদেব, পৃঃ ৮৫

২৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি', কঙ্কাবতী, রচনাসংগ্রহ, ৮ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৮, পৃ ঃ ১১

২৭. বসু, বুদ্ধদেব, 'ক্ষণিকা'; বন্দীর বন্দনা ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ১৭

২৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'বন্দীর বন্দনা,' বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ - পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এস. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ২৮

২৯. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৩০. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৩১. বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, নিউ এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ ৫৮

৩২. বসু, বুদ্ধদেব, 'বন্দীর বন্দনা,' বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ২৭

৩৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রেম ও প্রাণ', বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ৭৮

৩৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ৯৩

৩৫. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলাএকাডেমী, ১৯৯১, পৃ ঃ ৬৪ - ৬৫

৩৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'পুরানা পল্টন', হাঠাৎ আলোর ঝলকানি, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪২১

৩৭. বসু, বুদ্ধদেব, 'ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ', হঠাৎ আলোর ঝলকানি, রচনাসংক্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪২৭

৩৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'শাপভ্রষ্ট', বন্দীর বন্দনা ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৬২, পৃ ঃ ১২

৩৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'আমন্ত্রণ-রমাকে', একটি কথা (১৯৩২) বুদ্ধদেব বসু শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৭৭, পৃ ঃ ৩৩

৪০. সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিক কবিতার দিগবলয়, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৪০২, পৃ ঃ ২০৩

৪১. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১,পৃঃ৮

৪২. বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯১, পৃঃ ৩২

৪৩. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৪৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'আটচল্লিশের শীতের জন্য ঃ ২', যে আঁধার আলোর অধিক, ২-য় সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৫২

৪৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'মরত্বসংগীত', মরচে-পড়া পেরেকের গান, কলকাতা, ভারবি, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৫৪

৪৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'সন্ধিলগ্ন', স্বাগতবিদায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা) অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ১৫৭

৪৭. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৩৪

৪৮. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ১১৯

৪৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'সব পেয়েছির দেশে', কলকাতা, কবিতা ভবন, আগষ্ট ১৯৪১, পৃঃ

৫০. বসু, বুদ্ধদেব, উৎসর্গপত্র, সমরসেন স্মরণীয়েষু, দময়ন্তী, কলকাতা, কবিতাভবন, ১৯৪৩, পৃঃ১

৫১. বসু, বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিত্র, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৪-৫৫

৫২. বসু, বুদ্ধদেব, 'ঋতুর উত্তরে', যে আঁধার আলোর অধিক, ২-য় সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৪৭

৫৩. সাদিক মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৪৮

৫৪. চট্টোপাধ্যায় কমলেশ, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথপুরাণের সন্ধানে', বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৮৮, পৃ ঃ ৮৭

৫৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্য প্রভু', দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা, প্রথম যুগ্ম সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৩

৫৬. চট্টোপাধ্যায় কমলেশ, মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথপুরাণের সন্ধানে, বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, পুস্তক - বিপণি, ১৯৮৮, পৃ ঃ ৮৭

৫৭. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৫৩

৫৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে', শীতের প্রার্থণা ঃ বসন্তের, উত্তর, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা) অষ্টম সংস্করণ কলিকাতা, দে'জ - পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ৯১

৫৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'সন্ধিলগ্ন', স্বাগত বিদায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা), অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ১৫৬

৬০. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৫৭

৬১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ৭৮

৬২. বসু, বুদ্ধদেব, 'মোরা তার গান রচি', বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ৮০

৬৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'শাপভ্রষ্ট', বন্দীর বন্দনা, চতুর্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ১২

৬৪. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৩০

৬৫. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৫৮

৬৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'মরত্ব সংগীত', মরচে - পড়া পেরেকের গান, কলকাতা, ভারবি, ১৯৬৬, পৃঃ৫৪

৬৭. তদেব, পৃ ঃ ৫৪

৬৮. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৩০

৬৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ ৯

৭০. দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ', জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, ১ম খণ্ড কলকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৭, পৃ ঃ ৫৪

৭১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৫, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪৯৬

৭২. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, আষাঢ় ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪৯৫

৭৩. দাস, সজনীকান্ত, আত্মস্মৃতি, ১ম পূর্নাঙ্গসংস্করণ, কলকাতা, সুবর্নরেখা, ১৩৮৪, পৃ ঃ ২৫৫

৭৪. চক্রবর্ত্তী, সোনামণি, শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৯৯২, পৃ ঃ ৩৪৩

৭৫. সিংহ, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩, পৃ ঃ ২৩০

৭৬. বসু, বুদ্ধদেব, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড কলকাতা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৫৪৮

৭৭. তদেব, পৃ ঃ ৫৪৮

৭৮. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ ২২

৭৯. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮০. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮১. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮২. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৩. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৪. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৫. তদেব, পৃ ঃ ২৬

৮৬. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫০৫

৮৭. তদেব, পৃ ঃ ৫০৫

৮৮. বসু, বুদ্ধদেব, অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রগতি, ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৬৮

৮৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ১৭

৯০. বসু, বুদ্ধদেব, অতিআধুনিক বাংলাসাহিত্য, প্রগতি, ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, মাঘ - ১৩৩৪, রচনা সংগ্রহ - ৩-য় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৬৩

৯১. তদেব, পৃ ঃ ৫৬৪

৯২. তদেব, পৃ ঃ ৫৬৮

৯৩. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, ফাল্গুন ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫১০

৯৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'পুরানা পল্টন' - দ্বিতীয় অধ্যায়, রচনা সংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৪২৪

৯৫. তদেব, পৃ ঃ ৪২৪

৯৬. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ ৭০

৯৭. তদেব, পৃ ঃ ৭০

৯৮. তদেব, পৃ ঃ ৭০

৯৯. দত্ত, মীণাক্ষী, সম্পাদকীয়, বর্ষ-২০, 'কবিতা' - সংকলন ৩, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃঃ ৫৩-৫৪

১০০. তদেব, পৃ ঃ ৫৪

১০১. বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাদকীয়, 'কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন - ১৩৫৩)

১০২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৯৩৫ এর ৩রা অক্টোবর, রচনা সংগ্রহ, বুদ্ধদেব বসু, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৮২

১০৩. তদেব, পৃঃ ৫৮৬

১০৪. দত্ত, মীণাক্ষী, মুখবন্ধ, কবিতা - সংকলন ১, কলকাতা, প্যাপিয়াস, ১৯৮৭, পৃঃ ৮

১০৫. ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৯৮৭, পৃঃ ৩

১০৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৯

১০৭. Eliot, T.S., The Sacred wood, New Delhi, B.I. publications, 1976, page -1